নষ্টনীড়-২০০৬
-বিপ্লব

[
ভাবছিলাম ভিন্নমতের কবিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কি লিখি। দেখলাম অতো জ্ঞান নেই। তবে বুঝি। সেটাও বদলায়। কৈশরে যে রবীন্দ্রনাথকে চিনেছি, কলেজ জীবনে চিনলাম, অন্য রবীন্দ্রনাথ। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথও বদলায়। তাই হঠাৎ মনে হলো, আজ যদি রবীন্দ্রনাথ নষ্টনীড় গল্পটা লিখতেন, এবং আমেরিকায় বসে লিখতেন, তাহলে গল্পটা কেমন হতো? ধ্রুপদী সাহিত্য স্থান কাল নিরেপেক্ষ। কারন এর বক্তব্য সার্বজনীন। সেই জন্য নষ্টনীড় একশো চার বছর আগে লেখা হলেও, পরকীয়া প্রেমতো একশো চারবছরের পুরানো হয় নি। তা আজো নবীন। সাহিত্যের এই সার্বজনীন স্বাদ আস্বাদনের জন্য লিখতে বসলাম নষ্টনীড়-২০০৬।আমেরিকান পটভূমিকায়। গানের রিমেক হয়। সাহিত্যের ও হৌক। তবে ত্রুটি থাকবে প্রচুর-তাই আগেই ক্ষমাপার্থী]

(১)

কেজো হয়ে জন্মানোটা সমস্যা কি না, সেটা নিয়ে ভাবার অখন্ড অবসর কোনো কর্মবীরের ভাগ্যেই জোটে না। চল্লিশে পা দেওয়া মিলিয়ানার শান্তনু চৌধুরী, বডি শপিং কোম্পানী খুলে পয়সা করেছেন বিস্তর। ইদানিং ব্যবসায় ভাঁটার টান। তবে গনেশের দাক্ষিন্যে এতটা অবশ্য টান পরে নি যে তাকে নতুন ব্যবসায় নামতে হবে। অফিসে বড়জোর আধঘন্টা কাজ। দিনের শেষে দেখে নেওয়া, কটা ইন্টারভিউ এনেছে এম্পলয়িরা। সমস্যা হচ্ছিল হাতের অখন্ড অবসর নিয়ে। সাত পাঁচ ভেবে নিউজার্সি, নিউ ইয়ার্কের ভারতীয়দের জন্য একটা নিউজ পেপার ই খুলে বসলেন। এরপর অবশ্য অবসর সময়ে কি করবেন, তা নিয়ে ভাবার সময় পান নি শান্তনু।

শান্তনুর পিতৃদেব ছিলেন সি পি এমর ডাকসাইটে নেতা। ছেলেও রাজনীতিতে মুখ উজ্জ্বল করবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ছেলেকে টুলের ওপর তুলে কথা বলাতেন। স্টেটসম্যান এবং আনন্দবাজারের রাজনৈতিক সংবাদের তর্জমা করা ছিল দৈনন্দিন রুটিনের অন্তর্ভুক্ত। রাস্ট্রবিজ্ঞানে অধিক জ্ঞানার্জনের ফল হলো এই যে, দেশীয় রাজনীতির অন্তসারশুন্যতায় তিনি উৎসাহ হারালেন। প্রেসিডেনসি কলেজে ছাত্র রাজনীতির ছায়া মারান নি শান্তনু। তবে স্টেটসম্যানে চিঠি লিখতেন নিয়মিত। আমেরিকায় এসে জীবন সংগ্রামের ইঁটগুলি ই গড়ছিলেন, লেখা হচ্ছিলো না। ডটকম বার্স্টের পর অবসর মিললো প্রচুর। শান্তনু চৌধুরি নানান ইফোরামে অগুন্তি ইমেল লিখতে লাগলেন। বাঙালীদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষিত পলিটিক্যাল আন্যালিস্ট দুর্লভ। মেলে শুধু গাজোয়ারি খিস্তিবাজ লেখক। ফলে অল্পদিনের

মধ্যেই জনপ্রিয় হলেন চৌধুরীবাবু। লোক্যাল ভারতীয় ম্যাগাজিনে লেখক শান্তনু চৌধুরী জাঁকিয়ে বসলেন।

উডব্রিজে তার এক মাসতুতো ভাই, অনিল তরফদার ডটকম বার্স্টের পর বেকার বসেছিল। ইন্ডিয়া ফর ইউ বলে নিউইয়ার্কের এক ভারতীয় ম্যাগাজিনে সে পার্ট টাইম চাকরী শুরু করে। এসব চাকরিতে নাম যতটা হয়, পকেট ভরে না তার সিকি ভাগও। দাদার লেখক প্রতিভাই তার আস্থা ছিল কম, কিন্তু শাঁসালো পকেটের দিকে দৃস্টি ছিল বেশী। ফলে প্রস্তাব এলো দ্রুত-দাদা তুমি এতো ভালো লেখো, একটা পেপার বার করো। আমি বিজ্ঞাপন ধরে আনবো। গুজরাতি গুলোর কাছে আর কাজ করা যায় না যে!

অন্যের পেপারে লেখা সমস্যা নয়, বিশেষত সম্পাদকরা তাগিদ দিলে লেখকচিত্ত গদগদ করে। সমস্যা হচ্ছে এই সব ভারতীয় ম্যাগাজিন গুলো চলে বিজ্ঞাপনের টাকায়। ফলে অনেক সময়, লাস্ট মূহুর্তের আসা কোন বিজ্ঞাপনের জন্য লেখা বাদ দিতে হয়। রাজনৈতিক লেখার ওপর কাঁচি চলে আগে। কারণ, প্রবাসী ভারতীয়দের প্রায় সবাই বয়সে নবীন। যারা রাজনীতিকে দেশের গলায় চাপানো প্রহ্লাদের পাশান বলেই মনে করে।

ফলে অনিলের প্রস্তাবে উৎসাহিত হলেন শান্তনু। হাজার হলেও সম্পাদক হিসাবে নিজের নাম লেখা থাকবে। ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ওপর বুশকে যত খুশি গালি দিতে পারবেন। এই সেদিন ইনফি টিসি এসের বিরোধিতা করে এতো লিখলেন-শেষ বেলায় কোথাকার এক পানের দোকানের বিজ্ঞাপনের জন্য লেখাটা প্রিন্ট এডিশনে গেলো না!

সম্পাদকীয় কাজ নেশার মতন। বয়স কম হলে নেশা আরো মজে। সেটাই জাঁকিয়ে বসলো শান্তনুর জীবনে।

পেপার ভালোই চলছিল। স্থানীয় সমাজ এতোদিন চিনতো চোধুরীবাবুকে, এখন চেনে সম্পাদক শান্তনু চৌধুরীকে। যিনি, স্থানীয় ইন্ডিয়ান কম্যুনিটিতে নেতা ভাঙেন গড়েন।

শান্তনু যখন ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের খসরা তৈরী করে চলেছেন, ঘরের সম্পর্কের পয়েন্টারটি, স্বাধীন ঘুরির মতন উড়ছিল। নানান চ্যাট মেসেঞ্জারে নব্য নতুন নামে সময় কাটাচ্ছিলেন শান্তনু পত্নী তানিমা। বয়সে নবীনা। সিটিজেন না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করে বৌ আনা যায় না আমেরিকায়। ছত্রিশ বছর বয়সে সিটিজেন হলেন শান্তনু। বিয়ের ফুল ফুটলো বটে, তবে মদনঠাকুর বললেন সেটা নিয়মরক্ষা। যৌবনের সেই দুর্মর দিনগুলিতে, যখন পুরুষ কুক্কুরের ন্যায় নারীসঙ্গ কামনা করে, শান্তনু কাটিয়েছেন নিউইয়ার্কের রাস্তায়। ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে ঘন্টায় কুড়ি ডলার রোজগার। ওঁচা ক্লাবে সপ্তাহান্তে পাঁচটা ল্যাপডানস। মেয়েদের জন্য বাজেট পঞ্চাশ ডলার।

উঠতি যৌবনে বাঙালী পুরুষের রোম্যান্টিক ফ্যান্টাসির কোমল স্বপ্নের সেখানেই ইতি। স্ত্রীপারদের দহন-মর্দনে নারীর শরীরের প্রতি সেই বাঙালী রোমান্টিকতা অনেকদিন আগেই হারিয়েছেন শান্তনু। সেক্স এখন প্রস্বাব মলত্যাগের নিয়ম রক্ষা।

দেশে বাবা মা, ছেলের জন্য সম্মন্ধ খুঁজছিলেন। পকেটে ডলার থাকলে পৃথিবীর সর্বত্রই বিবাহযোগ্যা নারী নিতান্তই সুলভ। শান্তনুর বাবা মা শেষ পর্যন্ত বাইশ বছরের তানিমার প্রতি ই রায় দিলেন। তানিমা তখন চোদ্দ বছর ছোট। কানা ঘুঁশোও উঠেছিল বয়সের পার্থক্য নিয়ে। কিন্তু বয়স্ক বিবাহযোগ্য মেয়েদের মধ্যে হাজার খুঁত পেতেন শান্তনুর মা। হয়তো ভাবী পুত্রবধূর বয়স বেশী হলে অডিপ্লাস কমপ্লেক্স বাড়ে।

ব্রীজওয়াটারের বাড়ীটা দুজন প্রাণীর জন্য ভীষন বড়। সংসারের কাজ খুব ই অল্প। স্বামীর সময় নেই। এতেব, বন্ধ্যা ফুলের মতন রূপ রং গন্ধ নিয়ে সংসারে শোভাবর্ধনই নিয়তি হলো তানিমার।

আমরা দুজন, নাই কোন বন্ধন। এমন অবস্থায় স্বামীকে নিয়ে স্ত্রীর আহ্লাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দাম্পত্যলীলার সম্পর্ক রামধেনু রঙে সাজে। কিন্তু হায়! চাইলেই সবকিছু মনের মতন হয় না বলেই নারী সোহাগি হয়েও হতভাগিনী! দুর্ভাগ্য তানিমার। ভারত-আমেরিকার রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বোধ্য আচরনে, শান্তনু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। বিয়ের পর পুরুষের মানস সরোবরে স্ত্রীর পাটাতন এমনিতেই ছোট হতে থাকে। তারপর এই দুর্ভেদ্য পররাস্ট্রনীতি ভেদ করে, শান্তনুর মনোরাজ্যে ঢোকা একান্ত ই অসম্ভব বলে মনে হলো তানিমার।

এক বয়স্কা বন্ধুপত্নী তানিমার এই করুন দশা লক্ষ্য করে, শান্তনুকে ভৎসনা করলেন। নিউজার্সিতে বাঙালীদের মধ্যে বৌ পালানোর ঘটনা আকসার ঘটছে। সেটাও মনে করিয়ে দিলেন। এবার একটু নড়ে চরে বসলেন শান্তনু- তাইতো, তানিমার একটা সঙ্গিনী থাকা উচিত। ব্যাচারীর কিছু ই করার নেই।

পত্রিকা চালালেও, পত্রিকার উপায় কম। অনিলের সংসার চলে বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া টাকার উচ্ছিস্টে। তাই অনিলকেই ধরে বসলো শান্তনু-'তোমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতেই রেখে দাও। তানিমার একজন সঙ্গিনী দরকার। নইলে স্ত্রী বিদ্রোহে যেকোন দিন পত্রিকা লাটে উঠতে পারে'।

যদিও এমন সম্ভাবনা ছিল কম। তানিমার মন থেকে শান্তনু এখন অনেকটাই দূরত্বে। অনিল বুঝলো নিজের স্ত্রীকে বৌদির কাছে রাখলে খরচ কমে। এতেব মিতাকে বৌদির হাতে সমর্পন করে নিশ্চিত হলো।

সংসার জীবনের উষাকালে দাম্পত্যাকাশে যে রামধনু ওঠে, তা দ্রুত মিলিয়ে গেল। তানিমার সাথে শান্তনুর সম্পর্ক রোজনামচার ছকে দেখা হওয়া। আর খাওয়ার

টেবিলে দুটো কথা বলা। আগে সপ্তাহে একবার হলেও সেক্স হতো। ক্রমশ মাস, থেকে বছর ঘুরলো। এখন বড়জোর একসাথে শোয়া হয়। বাড়ির ফার্নিচারের ঝাঁড়পোক না মারলে, তা যেমন দ্রুত পুরোনো হয়, দাম্পত্য জীবন ও তাই। জীবনে নতুন কিছু না ঘটলে, দাম্পত্যের ফার্নিচারের ওপর ধূলো জমতে থাকে। সম্পর্কের বয়স বাড়ে দ্রুত।

তানিমা এমনিতে স্বভাব পাঠিকা। ইন্টারনেটের সুলভ জগতে সেই অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সোহাগের আযৌক্তিক অত্যাচার ছারা নারী বাঁচে কি করে? ইন্টারনেটে চ্যাটে কিছু পেন ফ্রেন্ড হয়েছে। কিন্তু সেই জগত নারীত্বের জন্য বড়ই দ্বায়িত্বশুন্য। পুরুষের কাজে না লাগলে, এই যৌবনে নারীত্ব স্যাঁতস্যঁতে ঘরে ফেলে রাখা আমকাঠ-ঘুন ধরে দ্রুত।

শান্তনুর কোম্পানীতে সন্দীপ বলে পঁচিশ বছরের এক সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে এই নিঃসঙ্গা দম্পতির সম্পর্কটা ঘনিস্ট রকমের। তানিমার ইন্টারনেট জ্ঞানের দীক্ষাগুরু সন্দীপ। কি করে আই পডের জন্য গান নামাতে হবে, কোন সফটওয়ারটা ইনস্টল করলে লতার লেটেস্ট গানটা শোনা যাবে, স্পাইওয়ারে কম্পুটার এট্যাক করলে কি আন্টি স্পাই ওয়ার নামাতে হবে, সর্বত্র ই তানিমার সিদ্ধিদাতা গনেশ সন্দীপ। বছর দুই আগে শান্তনুর কোম্পানী ই তাকে ভারত থেকে নিয়ে আসে। এমনিতে ব্যাচেলর দেওরদের বৌদিদের জন্য জীবনে সময় অখন্ড। অফিসে সন্দীপ যত কাজের মধ্যেই ব্যস্ত থাক, তানিমা বৌদির ফোনের প্রায়োরিটি প্রোজেক্ট ম্যানেজারের কয়েকগুন বেশী। বৌদিদের এতো কাজে আসলে, দেবরদের আবদারটাও বিচ্ছিরি রকমের বেড়ে যায়। প্রবাসে খাওয়ার আবদারটাও বাড়ন্ত-বাঙালী ব্যাচেলরদের সমস্যা খাঁটি বাঙালী রসনা। পেটের বাঙালী নাড়ী ভুরি গুলো যখন ডন বৈঠক দেয়, রন্ধনপটু নিসঃঙ্গা বৌদি সাক্ষাত জগদ্ধাত্রী। বৌদির ওপর পোস্ত চিংড়ি থেকে সর্ষে বাঁটা ইলিশের আবদারটা বিচ্ছিরি করমের বাড়তে থাকলো। লন্ড্রি করার অভ্যাসটা অনিয়মিত বলে, শান্তনুর জামায় বিটকে গন্ধ পেতেন তানিমা। তার ওপর দেওর একটা মাত্র টি-শার্ট পরে অফিস করে-সেই অজুহাতে যোগ হলো সাপ্তাহিক লন্ড্রিটা। দেওর-বৌদির সম্পর্কের বাজার অর্থনীতিতে, এমনিতে পুরুষের জিতবার উপায় কম। তবে সন্দীপের চরিত্রটি নিষ্পাপ -পুরুষের লালসার উত্তাপ সেখানে নেই। তাই না বুঝেই বৌদির ওপর খাবার ফর্দাটা টাঙাতো লম্বা। তানিমা প্রথমে বলতেন না। তবে তা নারী সুলভ কৃত্রিম, পুরুষকে মায়াজালে বাঁধবার ছল। নেমতন্ন আসতো পরের দিন ফোনে-‘সন্দু, তুমি আজ ই চলে এসো। বাজারে একটা পদ্মার ইলিশ পেয়ে গেলাম, তাই নিয়ে চলে আসলাম ভাই। বলতে পারো তোমার লাকটা ভালো।‘

চাহিদাটা যদি হয় পুরুষ সঙ্গের, তা সেই দৈহিক আর মানসিক ই হোক, নারী জীবনে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতেই রাজী থাকে। বিবর্তনের কুটিল ছক এমনই নির্দয়, কোন পুরুষ যে তার কাছে কিছু প্রাণ থেকে চাইছে, সেটাই তানিমার জীবনে ক্রমশ অপরাহ্নের বটচ্ছায়ার ন্যায় দীর্ঘতর হতে থাকল।

সন্দীপের চাকরী মেরিল লিঞ্চে। নিউ ইয়ার্কে। ও থাকে মালবোরোতে। যাতায়াতে সময় লাগে অনেকটা। তারপর, কোম্পানী খাটায় দশঘন্টা। ফলে রাতের শেষ নিউজার্সিট্রানজিটের ট্রেনে যখন ফেরে, মাঝে মধ্যেই খাবার থাকে না ঘরে। প্রচন্ড শীতে ম্যাকগুলো বন্ধ হয় দ্রুত। কাছাকাছি নেই কোন সেভেন ইলেভেন ও। ফলে জল খেয়েই শীতের দুঃসহ রাতগুলো কাটাতে হয় অনেক সময়।

ব্যাপারটা এমনিতে সমস্যা নয়-কিছু শুকনো খাবার ঘরে রাখলেই প্রবলেম সলভড।

কিন্তু আহ্লাদ ব্যাপারটাই এমনি। তা তুচ্ছ, অযৌক্তিক, ন্যাকামো, তা নিয়েই আবদার। নইলে তা হতো অনুরোধ। সন্দীপের নতুন আবদারটা খেজুর গুরের মুরকি। তানিমাকে একদম নতুন খেজুর গুরের মুড়কি বানিয়ে দিয়ে হবে। সেটা যে আমেরিকায় খুব বিচ্ছিরি রকমের শক্ত কাজ, তা তানিমা জানে বিলক্ষন। বাড়াবারিটা উপভোগ করেই দিল মুখ ঝাঁমটা-এতো সখ পেটে থাকলে বিয়ে করে আনো না!

জ্যাকসন হাইডের বাংলাদেশী দোকান ছারা নিউজার্সিতে খেজুর গুর পাওয়া যায় না। জ্যাকসন হাইড দুরত্বের নিরিখে কাছেই। কিন্ত ট্রেন বদল করতে হয়, তিনবার। সময় লাগে আড়াই ঘন্টা। তারপর বাইরে আড়াই ডিগ্রি শীত।

তানিমা একদিন ভালো মাছ আনার নাম করে জ্যাকসন হাইডে গেল। নতুন গুড় নিয়ে এলো। মুরকীও তৈরী হলো ভুট্টার খই দিয়ে। তারপর মুরীঘন্টর নেমতন্ন গেল সন্দীপের কাছে। সন্দীপ সাপ্তাহিক ঢেঁকুর তুলছে, এমন সময় একট বড় কোটো নিয়ে হাজির তানিমা।

সন্দীপ এতোটা আশা করে নি। ধারণা ছিল, বড়জোর মেক্সিকান মুরকী আছে কোটোতে। খুলে ও অবাক-একদম খেজুর গুরের মুরকি! যেমনটা বাড়ীতে পিসী বানাতেন।

তানিমা উচ্চস্বরে হেঁসে উঠলো। তবুও সে কোন পুরুষের কাজে আসে। নইলে নারীত্বে মরচে পড়তো এতোদিন।

তানিমার বাড়ীটা বড়। ব্যাক ইয়ার্ডটা আরো বড়। ওর বড় ইচ্ছা সেখানে বাগান করে। কথাটা পাড়লো সন্দীপের কাছে। কমিটি তৈরী হলো তৎক্ষণাৎ। প্ল্যানশুরু হলো উইকেন্ড থেকে।

জমিটা প্রায় এক একরের। পরিকল্পনাটা, ওখানে একটা ট্রপিক্যাল বাগান বানিয়ে চমকে দেবে। নিউ জার্সিতে বৃস্টি হয় প্রায় সব সময়-কিন্তু বছরে তিন মাস ছারা, তাপমাত্রাটা থাকে, ঠান্ডার দেশের। ফলে বাগানটা ট্রপিক্যাল হতে পারে, তবে হতে হবে মরশুমী-তিনমাসের। তাই ফুল-ফল বাছার কাজ চললো সাবধানে।

এখন জায়গায়টাই মোট চোদ্দটা আপেল গাছ। এটা মে মাস। ছোট ছোট সবুজ আপেলে জায়গাটা ভর্তি। ঝড় হলে, আমাদের দেশে বাগান ভর্তি হতো, ছোট ছোট কাঁচা আমে। এখানে হয় কাঁচা আপেলে। আমেরিকানরা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে স্যালাডে দেয়। তানিমার আবিস্কার কাঁচা আপেলের চাটনি!

হোমডিপোতে কোন দিন যায় নি সন্দীপ। ব্যাচেলরদের জন্য গৃহস্থলির টুকিটাকি আধিক্য। সেখানে বাগানের টুকিটাকি তো স্বপ্নের চন্দ্রযান। বাগান তৈরী করার বই গুলো উলটালো-কিছু বিদেশী টবের নাম জানলো জীবনে প্রথম।

শনিবার বাগান জরিপের দিন-ঠিক হলো মধ্যেখানে থাকবে একটা বাঁধানো পুকুর। শ্বেত পাথরের। নিউজার্সিতে হরিন বাড়ন্ত। পুকুরের দুই পাড়ে তৈরী হবে হরিন গৃহ। একধারে থাকবে ট্রপিক্যাল চয়েস-গাঁদা, রজনীগন্ধার উদ্যান। অন্যদিকে আমেরিকান সিলেকশন-এসলিয়া, লিলি, টিউলিপ।

পড়ন্ত বিকেলে ইন্টারনেটে বসে প্রোজেক্ট কস্টিং শুরু হতে মাথায় হাত। শুধু শ্বেত পাথরের পুকুর তৈরীর খরচই ষাট হাজার ডলার। ভেবে ছিল লাস ভেগাসের আলাদিন ক্যাসিনোর স্টাইলে একটা আশ্চর্য্য সরোবর করে চমকে দেবে শান্তনুকে। কিন্তু খরচের চমকানিতে সে আশাই সেগুড়ে বালি।

সন্দীপ বললে, বৌদি তাহলে সিমেন্টেড পুকুরই থাক।

নারীর কল্পনাগৃহের কামনার তীব্রতা বাস্তবলোকের অনেক উর্দ্ধে। তানিমা বললো না থাক তাহলে! শ্বেতপাথরের না হলে বাপু আমার চলবে না!

আউট অব কনটেক্সট হতে কারই বা ভালো লাগে? এই দুই নর-নারী যখন নিভৃতে আপন খেলাঘর বাঁধছিল, মিতার মন চাইছিল ওদের সাথে যোগদিতে। কিন্তু সেই মিটিংয়ে আমন্ত্রন নাই তার। মিতার মনে হয় সন্দীপটাও ভোঁদা-কেমন আছেন, ভালো আছি বৃত্তের বাইরে কথোপকপোন গড়াতে পারে না। মিতা হাঁক পাড়লো-তোরা কি করছিস?

আপেল কুড়াচ্ছি-তানিমা জবাব দিয়েই হেঁসে ফেললো।

দুটো আমার জন্যে আনিস।

ঈর্ষা ভিন্ন নারী সাদা পোঁচের দুর্গাপ্রতিমা। মিতার কল্পনা শক্তি নাই-সে এই আপেলের ঝোপ ঝারে, শকুন্তলার সুরম্য তপোবন কোনদিন ই কল্পনা করতে পারবে না। যদিও ভাবনা, তবুও রমনীমনকাননে দগ্ধ দিবসান্তে এ জল সিঞ্চন।

বাগানের কল্পনায় ছুড়ি কাঁচি চললো না-তবে অসম্ভবের সাধনায় মই নেই। তাই বাগানের পরিকল্পনা নেতানোর আগে, তানিমা করে বসলো আবদারঃ

সন্দীপ তুমি লেখো। ভাবো এই হচ্ছে সেই শকুন্ত বন। পারবে লিখতে?

খাঁটি ইঞ্জিনিয়ারদের খাঁটি বিরক্তি হচ্ছে ডকুমেন্টেশন-মানে লেখায়। সন্দীপ জিজ্ঞেস করে-বাগান কাটিয়ে লেখার শখ?

—না তোমাকে দিয়ে এই বাগানের একটা গল্প লেখাতাম। আলাদিনের শ্বেতপাথরের সরোবর-দুই পারে হরিণের ঘর। ওরা আসে জল খেতে। ওই কোনে বোগেনভেলিয়া ছায়ায় ধর বসে আছি। একবার লেখার চেস্টা করে দেখই না

ছেলে বেলায় স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতো সন্দীপ। সে অনেকদিন আগের ব্যাপার। তবে নারীর মায়ামোহবৃত্তে পুরুষের অনেক 'না' ই হ্যাঁ হয়ে যায়-নিভৃতে হাঁসেন গেমতত্ত্বের দেবতা।

-চেস্টা করবো। কিন্তু বিনে পয়সায় সেটি হচ্ছে না। কি দেবে বিনিময়ে?
-কি চাও?
-ভালো প্রশ্ন। ব্যাচেলর-তাই চাওয়ার থাকে একটি ই। একটা মেয়ে ধরে এনে দাও। সে ব্যাপারে বৌদিরা খুব কাজের হয় না। তাই মেয়ের বদলে একটা ওয়েল পেন্টিং দাও। তোমার বাগানের। আমি শ্বেতপাথরের সরোবরটা এঁকে দেবো মধ্যে। তুমি শেষ করবে তোমার বাগান। বাগানের বাউন্ডারিতে আঁকবে ড্যাফোডিল-মধ্যে থিসলে । হলুদ আর লালের লুকোচুরি। আমি লিখবো। তুমি আঁকবে।

-তোমার যেমন বাড়াবারি।

-কেন? সৌন্দর্য্যচেতনা অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নেই-যারা বাগান করে তাদেরও অনেকের ই নেই। তাই বাগানটা থাকে সুন্দর-চতুর্দিকের সীমানাটা লাগে কুৎসিত।

-আচ্ছা আঁকবো। তুমি লেখো আগে।

- ভরসা হয় না যে আমি লিখতে পারি?

-বিলক্ষন হয়। আমার স্বপ্নদৃস্টের বাগান নিয়ে যখন মোহাচ্ছনের মতন তোমায় বলছিলাম, তুমি তোমার খাতায় লিখছিলে। প্লিজ দেখাও একবার।

-নানা আজ থাক। কাল ভালো করে লিখে দেখাবো।

-ওটি হচ্ছে না-যা লিখেছো দেখাও। এটি দূর্গাদেশ। নড়চর হবার নয়।

সন্দীপকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল লনে-যেখানে মে মাসের পড়ন্ত বিকেলের

উত্তাপে হালকা শীতটা একটু হলেও সহ্য করা যায়। সন্দীপ পড়া শুরু করলোঃ

বৌদির বাগানঃ

সৃস্টি মাত্রই রহস্যময়। নির্মল। হতে পারে এই বাগান অলীক কল্পনা-বা কালকের বাস্তব। হয়তো ম্যাজিক রিয়ালিটি। সৃজনশীলতার উৎপত্তি মনের কোথায় কেও জানে না-জানতেও চাই না। এই রহস্যময়তাই ক্রিয়েটিভ প্লেজারের উৎস। ইত্যাদি।

-তুমি আবার লিখতে জানো না!

লেখক নবীন, রসিকা নবীনা। সন্দীপের জীবনে প্রথম সাহিত্যরস। প্রথম প্রহরের মাদকতা-রস সেখানে নবীন কিন্তু যৌবনের উনুনের ধিকি ধিকি আঁচে প্রথম কড়া পাক পরলো সেদিন।

মূঢ় মিতা! মননবন্ধ্যা নারীকে এই সাহিত্যরস বোঝাতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই কিছু আপেল কুড়িয়ে ঘরের দিকে দ্রুত রওনা হল তানিমা।